ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

আকাশ মালিক

(৪)

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

জামাল যুদ্ধে পরাজিত আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়ে, হজরত আলী (রাঃ) বসোরা থেকে কুফায় গমন করলেন ৩৬ হিজরীর রজব মাসে। সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করবেন। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখনও সিরিয়ার গভর্ণর। মুয়াবিয়া (রাঃ) যে, হজরত আলীকে খলিফা হিসেবে এত সহজে মেনে নেবেন না, তা আলীরও জানা ছিল। আর মুয়াবিয়াও হজরত আলীকে লোমে পশমে চেনেন। রহস্যজনক ভাবে মুয়াবিয়া, হজরত আয়েশার সমর্থনে জামাল যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করে, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেণ। আলীর জন্যে তা ছিল বিরাট এড্‌ভানটেইজ। কিন্তু আলী জানতেন না যে, আসলে হজরত মুয়াবিয়া সিরিয়ায় আলীকে লৌহ-কঠিন খাঁচায় বন্দী করার ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মুয়াবিয়া রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন যে- আলী ইচ্ছে করলে উসমানকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতালোভী আলী তা না করে হত্যাকারীদেরকে সহযোগীতা করেছেন এবং বাহুবলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। জামাল যুদ্ধে আলী যখন আয়েশার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে, মুয়াবিয়া তখন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। হজরত মুয়াবিয়া সারা পৃথিবীতে উমাইয়া বংশীয় শাসন কয়েম করতে চান। তার আগে হাশেমী বংশের মোহাম্মদের (দঃ) একমাত্র উত্তরাধিকারী হজরত আলীর জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দেয়া চাই।

হজরত উসমানের সু-দীর্ঘ বারো বৎসরের অপশাসনে আরব মুসলিম সাম্রাজ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল, উসমান হত্যার মধ্য দিয়ে তা আরো দ্বি-গুণ হয়ে দেখা দিল। আলীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব এই সর্ব প্রথম কোরায়েশ বংশের হাশেমী গোত্রের নবী মোহাম্মদের রক্ত-সম্পর্কের একজন খলিফা পেলো। আলী একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে কিন্তু দক্ষ রাজনীতিবিদ মোটেই ছিলেন না। ক্ষমতায় বসেই মারাত্মক ভুল করে বসলেন। আলীর চোখে ভেসে ওঠে মুসলিম সাম্রাজ্যের এক কুৎসিত ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি। তাঁর মনে পড়ে সেই কালো রাত্রীর কথা, যে রাত হজরত ওমর তাঁর দরজার সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলেছিলেন- ‘কে আছো ঘরের ভেতর বেরিয়ে এসো, আর আবু বকরের খেলাফত গ্রহন করো, অন্যতায় মানুষ সহ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো’। হজরত ফাতেমা বের হয়ে বলেছিলেন- ‘আমার ঘরে নবীজীর বিশ্বস্ত গোটা কয়েক সাহাবী মেহমান আছেন। ওমর, তুমি কি নবীজীর মেয়ের ঘর আগুনে পোড়াতে চাও যার হাতে আছে বেহেস্তের চাবী’? উল্লেখ্য, আবু বকরের খেলাফত গ্রহন করার পর থেকে, ফাতেমার ঘরে রাতে কিছু লোক নিয়মিত বৈঠক করে পরামর্শ করতেন। তারা ফাতেমা ও আলীর মতো আবু বকরের খেলাফত অস্বীকার করেছিলেন। ঐ ঘঠনার পর হজরত ফাতেমা তাঁর স্বামীকে অনুরুধ করেছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁকে রাতের আঁধারে গোপনে দাফন করা হয়, যাতে হজরত ওমর তাঁর জানাজায় আসতে না পারেন। এর কিছুদিন পরেই হজরত ফাতেমা ইন্তেকাল করেণ।

রাজ্যের সর্বত্রই আলী দেখতে পান মদ্য-পায়ী, উচ্চাভিলাসী, শারিয়া বিরোধী, স্বৈরাচারী, সেচ্ছাচারী, নারী-আসক্ত, ভোগ-বিলাসী, শাসকদের চেহারা। আলী এক সাথে সকল প্রাদেশিক গভর্ণরের পদ অবৈধ ঘোষনা করে দেন। রাগের বশে, আবেগের বশে, অথবা তাঁর ও তাঁর স্ত্রী হজরত ফাতেমার ওপর আবুবকর, ওমর ও ওসমান কর্তৃক সারা জীবনের অপমান, অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবেই হউক, আলীর এ কাজটি ছিল অদূরদর্শিতার প্রমান। বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্ণর উসমান হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করাতো দুরের কথা, আলীর খেলাফতই মেনে নিতে রাজী হলো না। 'উসমান হত্যার বিচার' ইস্যুটি ছিল হজরত মুয়াবিয়ার চক্রান্ত, আলীর জন্যে এক মরণ-ফাঁদ। মুয়াবিয়ার কাছে 'সবার ওপরে ধন আর ক্ষমতা সত্য' এর উর্দ্ধে কিছূই ছিল না। হজরত মুয়াবিয়াই নবী মোহাম্মদের (দঃ) ইসলাম সৃষ্টির গোপন রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মুয়াবিয়া ছিলেন মোহাম্মদের (দঃ) রাজনৈতিক সচীব। তাই রাজনৈতিক ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ট ফসল সম্ভবত তিনিই সব চেয়ে বেশী উপভোগ করেছিলেন। মুয়াবিয়া কোনদিনই মোহাম্মদের (দঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহনে আগ্রহী ছিলেন না কিন্তু তাঁর (মোহাম্মদের) মাষ্টার মাইন্ডেড ছল-চাতুরী, ভন্ডামী, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ভালভাবেই অনুকরণ করেছিলেন। আর আজ সেই দক্ষতাই মোহাম্মদের (দঃ) শেষ বাতিটি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে মুয়াবিয়া কাজে লাগাতে উদ্ধত হয়েছেন।

সারা মুসলিম জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উসমান হত্যায় জড়িত মিশর, মক্কা, কুফা, সহ বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহীগন হজরত আলীকে পরিস্কার হুমকি দিয়ে বসলো, যদি উসমান হত্যার বিচার করা হয়, তাহলে আলীকেও উসমানের মত বড়ই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক পথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। আলী দেখলেন তিনি আজ সাত-পাঁকে বাঁধা পড়ে গেছেন। তলোয়ার দিয়ে রক্তের হুলি খেলা যে আলীর নেশা, যে আলী মোহাম্মদের (দঃ) সহচরী হয়ে ৯৮টি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করে তাঁর কাছ থেকে 'আলী হায়দার' 'সাইফুল্লাহ্' 'বীর শ্রেষ্ট' খেতাব সমুহ পেয়েছিলেন, সে আলী আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বড়ই ক্লান্ত। আজ মানুষের রক্তাসক্ত, আলীর মাতাল তরবারী চায় একটু বিরতি, শান্তির একটু নিঃশ্বাস। কিন্তু তা-তো হবার নয়। ক্ষমতা আর রক্ত যে একে অপরের সম্পুরক, সে কথা বুঝতে আলীর মোটেই দেরী হলো না।

এখানে হজরত মুয়াবিয়ার জীবনের বিবিধ কার্যাবলী ও মোহাম্মদ (দঃ) বংশের হজরত আলীর সাথে তাঁর শত্রুতার কারণ বুঝার প্রয়োজনে মুয়াবিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া ভাল। মুয়াবিয়া ছিলেন সাহাবী হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার জারজ সন্তান। আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার বিবাহের তিন মাস পরে মুয়াবিয়া জন্মগ্রহন করেণ। তাঁর মাতা হিন্দা ছিলেন একজন বেশ্যা। উর্দুভাষী একাধিক ঐতিহাসিক, হিন্দার চারিত্রীক বর্ণনায় বেশ্যা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সুত্রানুযায়ী হিন্দা, বেশ্যা না হলেও তিনি যে, বহু-পুরুষগামী (Tart) মহিলা ছিলেন এবং মুয়াবিয়া যে তার জারজ সন্তান তার কিছু প্রমান পাওয়া যায় হজরত হাসান (রাঃ) ও হজরত আয়েশার (রাঃ) উক্তিতে। শাম ইবনে মোহাম্মদ কালভী (রঃ) তাঁর 'কিতাবে মোসাব' বইয়ে লিখেন- 'হজরত হাসান (রাঃ) (হজরত

আলীর ছেলে, নবী মোহাম্মদের দৌহিত্র) একদিন ব্যঙ্গ করে মুয়াবিয়াকে বলেন, তোমার কি মনে আছে তোমার আসল পিতা কে?' মুয়াবিয়া কর্তৃক হজরত আয়েশার ভাই মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর খুন হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবিবা (মুয়াবিয়ার বোন ও নবীজীর স্ত্রী) আয়েশাকে আস্ত একটি ছাগল রান্না করে সদকা হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেণ- 'এর অর্থটা কি'? উত্তরে উম্মে হাবিবা বল্লেন- 'উসমান হত্যার পুরুস্কার। তোমার ভাই উসমানকে খুন করেছিল'। আয়েশা অভিশাপ দিয়ে বলেন- 'বহু-পুরুষগামী হিন্দার মেয়ের ওপর আল্লাহ্‌র গজব বর্ষীত হোক'। এর পরে আয়েশা যতদিন জীবিত ছিলেন, উম্মে হাবিবা ও তাঁর মা হিন্দাকে নামাজ শেষে অভিশাপ দিয়েছেন। হিন্দা ইসলামের ইতিহাসে নবীজীর চাচা হজরত হামজার (রাঃ) কলিজা ভক্ষনকারী বলেও পরিচিত। ইবনে আবি আল্‌ হাদিদ তাঁর 'নাহ্‌জুল বালাগা' বইয়ে উল্লেখ করেণ- মুয়াবিয়ার জন্মদাতা সম্ভাব্য পিতা চারজনের নাম লোক মুখে শুনা যায়। আবি ইবনে ওমর বিন্‌ মুসাফির, ওমর বিন্‌ ওলিদ, আব্বাস্‌ বিন্‌ আব্দুল মুত্তালিব এবং সাবাহ্‌ (এক ইথোপিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ)। একই বক্তব্য পাওয়া যায় 'রাবিউল্‌ আবরার' কিতাবে আল্লামা হজরত জামাক্‌শারীর লেখায়। তবে যেহেতু হজরত আবু সুফিয়ানের, উৎবা নামে সর্বজন স্বীকৃত আরেকজন জারজ সন্তান ছিলেন, আমরা ধরে নিতে পারি, বিয়ের আগে আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার দৈহিক সম্পর্কের ফসল হজরত মুয়াবিয়া।

মোহাম্মদের (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান নিজ পরিবার ও গোত্রের মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। আবু সুফিয়ান পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান। বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর নিজের ও মোহাম্মদের (দঃ) মধ্যকার শত্রুতা, কোরায়েশ বংশের অগণিত মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা এক দীর্ঘ ইতিহাস। চল্লিশটি বৎসর যে ছেলেটাকে আদরে আহ্লাদে কেউ এতটুকু কঠু কথা বলেনি, সেই হাশেমী বংশের একটা এতিম ছেলের হাতে উমাইয়া বংশের একি করুণ পরাজয়। আবু সুফিয়ান ও তাঁর পরিবারের মন থেকে সেই পরাজয়ের গ্লানী কোনদিনই মুছে যায়নি। মোহাম্মদের কাছ থেকে, সরকারী উচ্চপর্যায়ে চাকুরী (সেক্রেটারী অব স্টেইট) দেয়ার অঙ্গিকার নিয়ে আবু সুফিয়ান ছেলে মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে অনুরুধ করেণ। প্রথমে রাজী না হলেও পরে দূর-প্রসারী ভবিষ্যত পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে মুয়াবিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেণ। মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শী, উচ্চাভিলাষী, চতুর রাজনীতিবিদ। তার অধীনেই মুসলিম সৈন্যগণ ত্রিপলী, আরমানিয়া, সাইপ্রাস সহ অনেক অঞ্চল দখল করে ভারত ও চীন দখল করতে চেয়েছিল। হজরত আলী তা ভাল করেই জানেন।

আলী ভাবলেন, মদীনার অলিতে গলিতে উসমান হত্যার আহাজারী, আকাশে বাতাসে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি থামতে না থামতেই আয়েশার বিরুদ্ধে করতে হলো জামাল যুদ্ধ। রক্ত-ক্ষয়ী জামাল যুদ্ধে দশ সহস্রাধিক মানুষের প্রান নাশের পরপরই, মুয়াবিয়ার সাথে আরেকটি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমুচিৎ হবে না। হজরত আলী, হামদান প্রদেশের গভর্ণর, বনি-বাজিলা প্রধান হজরত জারিরকে, মুয়াবিয়ার প্রতি একটি প্রস্তাব দিয়ে সিরিয়া পাঠালেন- 'সিরিয়ার গভর্ণর যেন অনতিবিলম্বে হজরত আলীর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহন করেন'। হজরত মুয়াবিয়া বিষয়টা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সুচতুর মুয়াবিয়া হজরত জারিরকে

এমন এক মায়াবিনী মন-মাতানো আতিথিয়েতা দিয়ে মুগ্ধ করে দিলেন যে, হজরত জারির ভুলেই গেলেন, তিনি কি জন্যে এসেছিলেন। মুয়াবিয়ার চোখ-জুড়ানো রঙ্গীন প্রাসাদে, চিত্তরঞ্জন করে হজরত জারির ফিরে আসলেন দীর্ঘ তিন মাস পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে। বল্লেন- 'মুয়াবিয়া হজরত আলীর সাথে রাষ্ট্রীয় কোন বিষয় নিয়ে কোনপ্রকার আলোচনায় বসতে রাজী নন, যতক্ষন পর্যন্ত না হজরত উসমানের হত্যাকারির ফাঁসি হবে। তিনি আরো বল্লেন-' এখনও হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কাটা আঙ্গুল দামেস্কের মসজিদের মিনারে ঝুলছে। সিরিয়ার আপামর জনসাধারণ আল্লার নামে জীবন মরণ কসম খেয়েছে, যতদিন পর্যন্ত হজরত উসমানের হত্যাকারী ও হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দামেস্কের মসজিদে উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রীর কাটা আঙ্গুল ঝুলন্ত থাকবে'। সাহাবী হজরত মালিক আল্ আশতার (রাঃ) ভীষন রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে হজরত জারিরকে বল্লেন- 'তুমিতো আমাদের প্রস্তাব মুয়াবিয়াকে আদৌ দাওনি। দীর্ঘ তিন মাস মুয়াবিয়া তোমাকে তার রাজপ্রাসাদে চিত্ত-বিনোদনে মত্ত রেখে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে'। এই সেই সাহাবী হজরত মালিক আল্ আশতার (রাঃ) যিনি অস্ত্রের মুখে হজরত আয়েশার দুই ভগ্নীপতি হজরত তালহা (রাঃ) ও যোবায়েরকে (রাঃ) আলীর খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। ভয়ঙ্কর মালিক আল্ আশতারকে হজরত জারির ভালভাবেই চেনেন। আলী যখন হজরত তালহা (রাঃ) ও যোবায়েরকে (রাঃ) তাঁর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহন করতে প্রস্তাব দেন, মালিক আল্ আশতার তখন তাদের মাথার ওপর উম্মুক্ত শাণিত তরবারী হাতে দন্ডায়মান। প্রচন্ড সাহসী বীর হজরত তালহা, যিনি ওহুদের যুদ্ধে নবীজীর প্রাণ রক্ষার্থে ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শত্রু-পক্ষের তীর-বর্শা নিজের বুকে-পিঠে গ্রহন করেছিলেন, মালিক আল্ আশতারের তলোয়ারের সামনে, আলীর খেলাফত অনিচ্ছাকৃত ভাবেই মেনে নিলেন। সাহাবী যোবায়েরকে জিজ্ঞাসা করায় যখন তিনি নীরব রইলেন, মালিক আল্ আশতার সিংহের মত গর্জে উঠে হজরত আলীকে (রাঃ) বল্লেন- 'আলী, যোবায়েরকে আমার কাছে আসতে দিন, তার মাথাটা তলোয়ারের এক আঘাতে দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।' উল্লেখ্য, ইসলামের চার খলিফা-নির্বাচনে প্রতিবারই একাধিক খলিফা-পদ-প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কোনবারই গনতান্ত্রীক পন্থায় নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং, কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের সময় থেকে। হজরত আলীর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। হজরত জারির বুঝতে পারলেন এখানে থাকা তার জন্যে নিরাপদ নয়। তিনি কুফা ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান এবং হজরত মুয়াবিয়ার সৈন্যদলে যোগদান করেণ। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট ছল-চাতুরি দেখে হজরত আলী নিশ্চিত হলেন, বিষয়টার ফয়সালা অস্ত্রের মাধ্যমেই হতে হবে। সুতরাং আবারও যুদ্ধ, আবারও রক্ত-পাত। আলীর জেষ্ঠ্য পুত্র হজরত হাসান, সিরিয়া আক্রমন করতে পিতাকে নিষেধ করলেন । হাসান বল্লেন-' পিতা, প্রয়োজন হলে খেলাফত ছেড়ে দিন, মোয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে যাবেন না, মুয়াবিয়া সাংঘাতিক ভয়ানক মানুষ। এ যুদ্ধে মুসলিম জাহানের মারাত্নক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর কত রক্তপাত, আর কত প্রানহানি'? হজরত আলী বল্লেন- 'আজ যদি মুয়াবিয়াকে ছাড় দেয়া হয়, যদি তার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে না পারি, অল্পদিনের মধ্যেই সারা মুসলিম বিশ্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করে বসবে'। হজরত আলী বিলম্ব না করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হয়ে যান। আলীর ইচ্ছে হলো উত্তর দিক থেকে আক্রমন করে সিরিয়া দখল করবেন। তাই মেসোপটামিয়ান মরুভুমির মধ্য দিয়ে একদল সেনাবাহিনী অগ্রীম পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেনাদলটি আল্-ফোরাত নদীর পশ্চিম কিনারে এসে মুয়াবিয়ার একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধ্য হয়ে তারা মেসোপটামিয়ান ফিরে যায়। এদিকে হজরত আলী মূল সৈন্যদল নিয়ে টিগরিস হয়ে পশ্চিমে মসুল এলাকার ফাঁড়ি পথে মেসোপটামিয়ান অতিক্রম করে আল্-ফোরাত নদীর উপরিভাগে 'আর্-রাক্কা' নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। আর্-রাক্কা 'বালিক' ও 'আল্-ফোরাত' নদীর মোহনা স্থান। অবাক বিস্ময়ে আলীর সৈন্যদল লক্ষ্য করলেন নদী-পাড়ে এক বিরাট মানব বন্ধন তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মালিক আল্ আশতার শাণিত তরবারী উঁচু করে তাদেরকে আক্রমন করার হুমকি দিলেন। জনতা ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিল। সিরিয়ার সিমান্ত এলাকায় পৌছার পথে বেশ কয়েকটি যায়গায় হজরত আলীর সৈন্যদলের সাথে মুয়াবিয়ার ছোট ছোট সেনাবাহনীর খন্ডযুদ্ধ হয়। ৩৬ হিজরীর জিল্হাজ মাসে, আলী তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার 'সিফ্ফীন' নামক স্থানে এসে মোয়াবিয়ার ১২০ হাজারের মূল সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। ইতিমধ্যে আলীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজারে। আলী বুঝতে পারলেন চতুর্দিকে ব্যারিকেড, নদী পারে পানি-পথ বন্ধ, ১২০ হাজার সৈন্য মোতায়ন, এসকল মুয়াবিয়ার বহুদিনের সুনিপুণ আয়োজন।

'সিফ্ফীন' ময়দানে এসে আলী (রাঃ) বিনা যুদ্ধে তাঁর খেলাফত স্বীকৃতি আদায়ের সকল প্রকার শেষ চেষ্টা করলেন। উসমান হত্যার বিচার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্যে প্রতিনিধিদল পাঠালেন, নিজেও মুয়াবিয়ার কাছে ব্যক্তিগত পত্র দিলেন। কিন্তু তাঁর এই কোমলমতি আচরণ তীক্ষ্ম বুদ্ধির মুয়াবিয়ার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলো না। মুয়াবিয়া জানেন আলী মিথ্যাবাদী, প্রতারক। বসোরায় আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধের সময়ে আলী প্রথমে হজরত তালহা ও হজরত যোবায়েরের প্রশংসা করে তাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 'তালহা তুমি রাসুলের (দঃ) একজন বিশ্বস্ত সাহাবী, ইসলামের একজন সাহসী বীর সৈনিক। তুমি আর আমি নবীজীর পাশে থেকে অনেক যুদ্ধ করেছি। তুমি না'হলে নবীজীকে ওহুদের যুদ্ধে সাহাবী হজরত খালিদ বিন্ অলিদের (রাঃ) হাত থেকে রক্ষা করা মুশকিল হতো। উল্লেখ্য, মহাবীর খালিদ বিন্ অলিদ, ওহুদের যুদ্ধে মোহাম্মদের (দঃ) মাথায় তরবারী দিয়ে এমন আঘাত করেছিলেন যে, নবীজীর হ্যালমেট ভেদ করে মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগায় তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। একপর্যায়ে আলী যখন বল্লেন- তোমরাতো সেচ্ছায় আমার খেলাফত মেনে নিয়েছিলে, তাহলে আজ কেন আমার বিরোধিতা করছো? তালহা ও যোবায়ের একবাক্যে চিৎকার করে বল্লেন- 'আল্লাহ্র কসম, আমাদের মাথার ওপর তলোয়ার রেখে আলী স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন'। বসোরার জনগন বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে একদল লোক মদীনায় প্রেরণ করলো। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো, আলী শুধু তালহা ও যোবায়েরকেই নয়, অনান্য নেতৃপর্যায়ের লোক যারা খেলাফতের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দী হতে পারেণ, সকলকেই জোর পুর্বক তাঁর খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। মুয়াবিয়া এও জানেন, তালহা ও যোবায়েরের এতো প্রশংসাকারী আলীই তাদেরকে হত্যা করে আয়েশার দুই বোনকে একসাথে বিধবার কাপড় পরিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া মনে মনে ভাবলেন- আলী, আয়েশার বসোরা দেখেছো,

মুয়াবিয়ার সিরিয়া দেখো নাই। আলীর প্রতিউত্তরে মুয়াবিয়া জানিয়ে দিলেন- 'উসমান হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত একটা সৈন্যও রণক্ষেত্র থেকে সরানো হবে না'। এতক্ষণে হজরত আলী বুঝলেন এখানেই হবে হয়তো তার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হয়তো সুচনা করবে ইসলামের ভিন্নমুখী এক নতুন ইতিহাস। মুয়াবিয়া জানেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আলীর পক্ষে সম্ভব নয়। আলীও জানেন তার সেনাবাহিনীর বেশীরভাগ লোকই উসমান হত্যায় জড়িত। আলীর সেনাপতি মালিক আল্ আশতার ও মোহাম্মদ বিন্ আবু-বকর তাদের অন্যতম। উসমান হত্যাকারীদেরকে মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করা আর প্রকারান্তরে তাঁকে খলিফা মেনে নেয়ারই সমান।

৬৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস (জিলহাজ ৩৭ হিজরী) সৈন্য মোতায়েন, সংলাপ বিনিময়, ছোট ছোট খন্ডযুদ্ধে অতিবাহিত হলো। মে মাসে বিশাল প্রশস্ত সিফ্‌ফিন মাঠ, ইসলামের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সেনাদলের পদাঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠলো। বর্শা আর তরবারীর ঝন-ঝনানী শব্দে, রণ-বাদ্যের হুংকারে স্তব্ধ হয়ে যায় জগতের পশু-পক্ষী, জীব জন্তর কলরব। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর ১২০ হাজার সৈন্যকে ৮জন সেনাপতি দিয়ে ৮টি দলে বিভক্ত করলেন। অপর পক্ষে আলীও তাই করলেন। যুদ্ধের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য, এই বিশাল আয়োজন দেখে উভয় পক্ষই আতঙ্কিত হলো, এই বুঝি ইসলাম ও মুসলিম জাতী বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়। কেউই পুরোদমে (Full scale) যুদ্ধ শুরু করতে চাইলো না। বিচ্ছিন্নভাবে সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধ চল্লো পুরো একমাস। আসলো জুন, ৩৭ হিজরীর পবিত্র মোহার্‌রম মাস। উভয় পক্ষই যুদ্ধ-বিরতি চাইলো। আলী পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টার সমাধান চাইলেন। চতুর মুয়াবিয়া বিরতির সময়টাকে প্রপাগান্ডা ছড়ানোর কাজে লাগালেন। আলীর সৈন্যদলে যারা উসমান হত্যার বিচার কামনা করে, তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আলী সত্যিকার অর্থে উসমান হত্যার বিচার করবেন না, কারণ হত্যাকারীরা আলীর আত্মীয়, আলী তাদেরকে চেনেও না-চেনার ভান করেণ। আলী হজরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করাতো দূরে থাক বরং অনেককে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে পুরুস্কৃত করেছেন। আলীর কিছু লোক তাঁর ওপর সন্দেহ পোষন করতে শুরু করলো। উভয় পক্ষের সংলাপ চলতে থাকলো। এক পর্যায়ে সিরিয়ার সংলাপ প্রতিনিধিদল আলীকে প্রশ্ন করেন- 'আলী, আপনার দৃষ্টিতে খলীফা উসমানকে হত্যা করা কি ন্যায়-সঙ্গত ছিল'? আলী জবাব দেন- 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলবো না'। মুয়াবিয়ার প্রপাগান্ডার বৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করলো। আলীর সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তিনি দেখলেন এখান থেকে বিনা যুদ্ধে পরিত্রাণ পাওয়ার সকল পথ মুয়াবিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আরবী সফর মাসে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রতি দিন উভয় পক্ষে শতশত প্রাণহানি ঘটতে থাকলো। আলীর সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) একাই এক দিনে, প্রতিবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে এক এক করে ৪০০ জন শত্রুর মস্তক কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুয়াবিয়ার একজন সৈন্য আলীর পেছনে ধাওয়া করে এসেছিল। আলী তলোয়ার দিয়ে তার পেট বরাবর এমন শক্ত কোপ মেরেছিলেন, চোখের পলকে লোকটির শরীরের নীচভাগ ঘোড়ার পিঠে রেখে উপরিভাগ মাটিতে পড়ে যায়। সুর্য্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত, সন্ধা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চল্লো। দিনে-দিনে প্রাণহানীর

সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। তবে তুলনামুলক ভাবে মুয়াবিয়ার দিকে হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশী। আলীর সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন, বিজয় নিকটবর্তি। মুয়াবিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মুয়াবিয়ার সেনাপতি সাহাবী হজরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) তাদের শ্রেষ্ট প্রতারণার অস্ত্রটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলেন। মুয়াবিয়ার অনুমতি নিয়ে হজরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) তার সৈন্যবাহিনীর বর্শার ফলকে ৫০০ কপি কোরআন গেঁথে দিয়ে উড়াতে নির্দেশ দিলেন। আলীর সেনাবাহিনী থমকে গেল, বিষয়টা কি? আমর ইবনে আ'স বল্লেন- আর রক্তপাত নয়, উভয় পক্ষের অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়ে গেছেন। আমরা অস্ত্র নয়, কুরআনের মাধ্যমে ফয়সালা চাই। হজরত আলী তাঁর সিপাহীদেরকে নিষেধ করলেন- 'সাবধান মুয়াবিয়ার প্রতারণায় কর্ণপাত করোনা, এ নিসক প্রতারণা বই কিছু নয়'। বেশকিছু সৈন্য আলীর কথা অমান্য করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। আলীর সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) দৌড়ে এসে বল্লেন- 'আল্লাহ্‌র কসম, আর কিছুক্ষণ সময় তোমরা দৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, বিজয় আমাদের অনিবার্য'। এক নাগাড়ে একমাস যুদ্ধ করে অবশ ক্লান্ত দেহের, আলীর একদল সৈন্য হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বল্লো- 'আমরা অস্ত্রের চেয়ে কুরআনের মাধ্যমে ফয়সালা শ্রেষ্ঠ মনে করি'। চতুর্দিক দিক থেকে 'আল্লাহ্‌র আইন, কুরআনের ফয়সালা' চিৎকার ধ্বনি শুনা গেলো। আলী পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তার দলের কিছু লোক, এই বলে আলীর ওপর অভিযোগ আনলো যে, আলী ইচ্ছে করেই ক্ষমতার লোভে মুসলিম জাতীকে এ যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন, এবং তিনি উসমান হত্যার বিচার মোটেই চান না। আলীকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো।

বনি-কিন্দা প্রধান হজরত আল্-আশা'ত, মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞেস করেণ- '৫০০ খানি কোরআন বর্শার মাথায় গাঁথার মা'নেটা কি'? মুয়াবিয়া বল্লেন- 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছের ওপর, তাঁর কোরআনে লিখিত সমস্যার সমাধান খোঁজা আমাদের উচিৎ'। কোরআনকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেও মুয়াবিয়া কোরানিক সমাধানটা নিজেই দিয়ে দিলেন। বল্লেন- ' উভয় পক্ষ নিজনিজ দল থেকে একজনকে প্রধান করে মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করা হউক। মধ্যস্থতাকারী দুই প্রধান যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে'। আলীর লোকজন সমস্বরে বলে উঠলেন-'আমরা মানি, আমরা মানি'। বৈঠক বসার আগে হজরত মুয়াবিয়া অতি গোপনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেল্লেন। হজরত উসমানের সময়ের মিশরের গভর্ণর হজরত আমরকে বল্লেন- 'বৈঠকে সিদ্ধান্ত যা-ই হউক তুমি মিশর ছাড়বে না'। হজরত আমর বল্লেন- 'যদি মিশর আলীর দখলে চলে যায়'? সর্ব প্রথম মিশর আক্রমন করা হবে, তোমরা প্রস্তুত থেকো। মুয়াবিয়া হজরত আমরকে আশ্বস্ত করলেন। আলীর পক্ষে মধ্যস্থতাকারী দল-প্রধানও মুয়াবিয়ার তৈরী। আলী প্রস্তাব করলেন দল-প্রধান হিসেবে প্রবীন নেতা আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম। আলীর লোকেরা প্রতিবাদ করলো। তারা প্রস্তাব করলো মুয়াবিয়ার সমর্থক হজরত আবু-মুসার (রাঃ) নাম। আলী বল্লেন- 'সর্বনাশ, আবু-মুসা একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। তাকে আমি কুফার অস্থায়ী গভর্ণর করে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার খেলাফত অস্বীকার করায় এই সেদিন আমি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি'।

আজ আলীর অন্ধসমর্থনকারী কুফাবাসীও আলীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তারা বল্লো- 'আলী তোমারই কারণে আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধে কুফার হাজার হাজার নারী বিধবা হয়ে কাঁদছে, তাদের চোখের জল আজও শুকায়নি'।

জীবনে কোন অস্ত্র-যুদ্ধে হজরত আলী পরাজিত হন নি। আজ বিজয়ের দ্বার-প্রান্তে এসে এমন অসহায় পরিণতি আলীর প্রশস্ত বুকটিকে অশ্রুজলে সিক্ত করে দিল। পরাজিত না হয়েও নিজেকে পরাজিত ভাবলেন। মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আস আর আলীর পক্ষে আবু-মুসা হলেন বিচারক। চির পরিচিত দু'জন দুর্ধষ সন্ত্রাসী ডাকাত, দু'জন গণশত্রু। ভীত-সন্ত্রস্ত, স্বজনহারা সাধারণ মানুষ যে কোন শর্তেই হোক সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের অবসান চায়।

৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী (৩৭ হিজরীর রমজান মাস) ঐতিহাসিক 'আলী-মুয়াবিয়া' শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

সত্তর হাজার মানুষের রক্তে আজ স্যাত স্যাতে পিচ্ছিল সিফ্‌ফিনের বিশাল সবুজ মাঠ। হজরত আলীর ২৫ হাজার আর হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষের ৪৫ হাজার মানুষের গলাকাটা লাশ পড়ে রইলো সিফ্‌ফিন-প্রান্তরে। সন্ধি-পত্রে সাক্ষর দেখতে মক্‌কা, মদীনা, সিরিয়া, কুফা, বাসারা, মিশর সহ রাজ্যের সকল প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলো। কোন এক গোপন রহস্যে হজরত মুয়াবিয়া, 'সন্ধি-পত্র' লেখার দায়ীত্ব গ্রহনের জন্যে আলীর পক্ষকে অনুরুধ করলেন।

তারা সন্ধি-পত্র তৈরী করতে থাকুন, ইত্যবসরে আসুন দেখা যাক, যুদ্ধের মাঠে ও যুদ্ধের নিকটবর্তি সময়ে, কে কোথায় কি বলেছিলেন।
হজরত আম্মার (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ আলীর একদল সৈন্যকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভাষন দিচ্ছিলেন- *'বন্ধুগণ, তোমরা কি শুনো নাই, নবীজী জীবিতকালে বহুবার বলেছেন, যে লোক আমার আলীকে দুঃখ দেবে, মনে করো সে আমাকেই দুঃখ দিল, যে লোক আমার আলীর বিরুদ্ধাচারণ করবে, মনে করো সে আমারই বিরুদ্ধাচারণ করলো। তোমরা কি জানো না এই মুয়াবিয়া একজন বিধর্মী, ইসলামের শত্রু, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রেমে ইসলাম গ্রহন করে নাই? তার রাজ-প্রাসাদে অমুসলিম নারীদের আনাগোনা, বিধর্মীদের সাথে তার মেলামেশা। আমরা জেহাদ করছি নবীজীর শত্রুদের বিরুদ্ধে, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাতে'।*

হজরত আম্মারের (রাঃ) কথা সম্পূর্ণই সত্য। মুয়াবিয়া এবং তাঁর পিতা আবু-সুফিয়ান সেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন নাই। ঘঠনাটি ছিল এরকম-
মক্‌কা বিজয়ের পরপরই নবী মোহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ নেতা আবু-সুফিয়ানকে তাঁর একটি খাস কামরায় তলব করলেন। বুদ্ধিমান আবু-সুফিয়ান ঘরে ঢুকেই ঘরের পরিবেশ দেখে অনুমান করতে পারলেন, কি জন্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে। মোহাম্মদের (দঃ) ডানে বামে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। হজরত ইবনে-আব্‌বাস (রাঃ) তাদের একজন। ইবনে-আব্‌বাসের চাঁদরের নীচে তলোয়ার লুকানো। কোরায়েশ নেতার বুঝতে বাকি রইলো না মোহাম্মদ (দঃ) তাকে কি প্রশ্ন

করবেন। মাথা দেবে, না মোহাম্মদের অধীনতা মেনে নেবে? আবু-সুফিয়ান অধীনতা মেনে নিলেন। ঘরে গিয়ে পুত্র মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার পরামর্শ দিলেন। মুয়াবিয়া বল্লেন- 'একি বলছেন আপনি? এই সেদিন বদরের যুদ্ধে আপনার চোখের সামনে মোহাম্মদ আমার দুটি ভাইকে খুন করেছেন। আপনি নিজের হাতে আপনার ছেলেগণকে দাফন করেছেন। পুত্র-শোকে মা আমার পাগল-বেশে মক্কার অলিতে গলিতে গড়াগড়ি করেছেন। ইসলাম গ্রহন করবো না, আমি এর প্রতিশোধ নেবো'। আবু-সুফিয়ান বল্লেন- 'শত্রুকে শক্তিবলে পরাজিত করতে না পারলে, তার দলে যোগদান করা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিশোধ নেয়ার সময় একদিন আসতেও পারে'।

হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুয়াবিয়ার সৈনদলের এক সেক্টর-কমান্ডার ছিলেন। উবায়দুল্লাহ, সাহাবী হজরত ওমরের (রাঃ) সেই সন্ত্রাসী পুত্র, যিনি উসমানের শাসনামলে, তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনের আসামী, যাকে জনতার আদালতে হজরত আলী মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন, আর উসমান তাকে বেকসুর মুক্তি দিয়েছিলেন। আজ সিফ্‌ফিনের ময়দানে সাহাবী হজরত ওমরের (রাঃ) পুত্র উবায়দুল্লাহ ও সাহাবী হজরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্র আব্দুল্লাহ্ একে অপরকে বধ করতে অস্ত্র-হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার সৈন্যদেরকে বলেন- *'আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার সমর্থক সিপাহী সাথীরা, আমার চক্ষের সামনে হজরত উসমানের খুনীকে (আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুবকরকে ইঙ্গিত করে) স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যে সকল খুনীদের বিচার আলী করতে পারেন নি, আজ এই মাঠে তাদেরকে হত্যা করে আমরা খলিফা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেবো, আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো'।*
উবায়দুল্লাহর সেই সাধ পুরণ হয়নি। কিছুক্ষণ পরেই আলীর সৈন্যের তীরের আঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহর মরদেহ কেউ না তুলেই পলায়নের পথ খোঁজছিল। উবায়দুল্লাহ যা বলছিলেন, তা আংশিক সত্য। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুবকর, উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন, কিন্তু আলীর ৯০ হাজার সৈন্যদলের সবাই উসমান হত্যার পক্ষে ছিলেন না। সত্যকথা হলো, মুয়াবিয়ার দলেও উসমান হত্যায় জড়িত অনেক লোক ছিলেন। মুয়াবিয়া অতি কৌশলে কিছু লোককে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে, যাকে যেভাবে পারেণ লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং হজরত আলী (রাঃ) উসমান-হত্যার বিচার করলেও সিফ্‌ফিন যুদ্ধ এড়াতে পারতেন না।

মোহ্‌রম মাসে যুদ্ধ বিরতির সময়ে মুয়াবিয়ার এক যোদ্ধাকে হজরত হাশিম ইবনে উৎবা (রাঃ) বলেন- *'তোমাদের হয়েছেটা কি? তোমরা কেন বুঝনা উসমানকে কেন আমরা হত্যা করেছি। উসমান নিজের পছন্দের লোক দিয়ে কোরআন লিখিয়েছেন। নবী-পরিবার ও কোরআনের অবমাননা করেছেন, আগুন দিয়ে কোরআন পুড়িয়েছেন। যারা জালিম খলিফা উসমানকে হত্যা করে নবীর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারাতো নবীর বিশ্বস্ত লোক। তোমরা কি নবী-পরিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে'?*

হজরত আলী একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের চারিত্রিক পরিচয় দিলেন। তম্মধ্যে হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আমর ইবনে আ'স, হজরত আবি মুয়্যাত, হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত ইবনে-আবি সারাহ্,

হজরত হাবিব মাসলামাহ্ অন্যতম। আলী বল্লেন- *‘মুয়াবিয়া বিধর্মী, উবায়দুল্লাহ সর্বজন নিন্দিত সন্ত্রাসী খুনী, আমর ইবনে আ’স লুটেরা, ডাকু স্বৈরাচারী, ইবনে-আবি সারাহ্ নিজে কোরআন লিখে এখনো কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী বলে বিশ্বাস করে না, আবি মুয়্যাত ও হাবিব মাসলামাহ্ দেশ-দ্রোহী, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস-ঘাতক। তোমরা সবাই এদেরকে না চিনলেও আমি ছোটবেলা থেকে এদেরকে চিনি, জানি। তোমরা বিশ্বাস করো, এ জেহাদ মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের জিহাদ, এ জেহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জেহাদ’।*

শেষ পর্যন্ত ৭০ হাজার মানুষের প্রাণ নাশের পর যুদ্ধ থামলো। এবার সন্ধি-পত্র লিখা হবে। মক্কা, মদীনা, কুফা, সিরিয়ার বড়-বড় প্রবীন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। লেখক লিখলেন- *‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, এই মর্মে আমীরুল মোমেনীন হজরত আলী (রাঃ) ইবনে আবি তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান-------’*
থামুন ! বজ্র-কণ্ঠে আমর বিন্ আ’স লেখককে থামিয়ে দেন। কি ব্যাপার? লেখক জিজ্ঞেস করেণ। আমর বলেন- *‘আমীরুল মোমেনীন হজরত আলী (রাঃ)’* লাইনটি কেটে ফেলা হউক। আলী তোমাদের আমীরুল মোমেনীন হতে পারেণ আমাদের নন’। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলীর বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। যেন একটা বিষ-মাখানো তীর তাঁর বুক ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আলী বুঝলেন, মুয়াবিয়া বহুদিনের পুরনো একটি ঘঠনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটালো। সেদিন মুহাম্মদ (দঃ) ও আবু-সুফিয়ানের মধ্যকার ঐতিহাসিক ‘হুদাইবিয়া-সন্ধি’ কালে একই ঘঠনা ঘটেছিল। ঐ দিন কলম ছিল আলীর হাতে। আলী লিখছিলেন- *‘পরম করুণাময় আল্লার নামে, এই মর্মে আল্লাহ্‌র রাসুল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ও আবু সুফিয়ান ইবনে -----’*
থামুন ! আবু সুফিয়ান ধমক দিয়ে বলেছিলেন- ‘*আল্লাহ্‌র রাসুল* কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ লিখা হউক, মুহাম্মদ তোমাদের রাসুল হতে পারেণ, আমাদের নয়’।
হজরত আল্ আহনাফ (রাঃ) বল্লেন- ‘দোহাই আপনাদের, হজরত আলীর নাম থেকে ‘আমীরুল মোমেনীন’ উপাধিটি মুছে ফেলবেন না, নবী-বংশকে জগত থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলার এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। নবীজীর কথা মনে পড়ায় আলীর চোখের জলের বাধ ভেঙ্গে যায়। ফোটা দু’এক অশ্রু গাল বেয়ে তার দাড়ি ভিজিয়ে দিলো। জীবনে নবীজী দু’জন মানুষকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, একজন আলী, আর একজন হজরত ফাতেমা (রাঃ)। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, ‘হুদাইবিয়া-সন্ধি’ কালে নবীজী যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আলী বল্লেন- ‘ঠিক আছে ‘আমীরুল মোমেনীন’ কথাটি মিটিয়ে দেয়া হউক’। উভয়পক্ষের প্রতিনিধি-প্রধানগণ পরামর্শ দিলেন, যতদিন পর্যন্ত কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত না করেছেন, ততদিন পর্যন্ত আলীর লোকজন আলীকে, ও মুয়াবিয়ার লোকজন মুয়াবিয়াকে তাদের খলিফা হিসেবে মেনে চলবে। কেউ কাউকে আক্রমন করতে পারবে না। কমিটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সময় নিলেন কম পক্ষে ছয় মাস। এবার নিজ নিজ লাশ গ্রহনের পালা। মানুষের রক্তে পিচ্ছিল মাঠ, হাটতে গিয়ে অনেকেই বারবার হোঁচট খেলো। উভয়পক্ষের সত্তর হাজার মানুষ আর গৃহে ফিরে এলো না। স্বামীহারা বিধবাদের আর্ত-চিৎকার, পিতৃহারা শিশুদের ক্রন্দন-রোল শুনা গেলো আরব দেশের ঘরে-ঘরে বহু দিন বহু রাত।

চলবে-